

নবী কাহিনী: ১২তম
হযরত ইউসুফ আ
১ম পর্ব

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আসসালামু'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি
ওয়া বারাকাতুহ

নবীগণের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আঃ) হ'লেন একমাত্র নবী, যাঁর পুরা কাহিনী একটি মাত্র সূরায় ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই সূরাটি নাযিল হয়েছে রাসূল সা এর দুঃখের বছর। সূরা ইউসুফ-এর ১১১টি আয়াতের মধ্যে ৩ থেকে ১০১ আয়াত পর্যন্ত ৯৯টি আয়াতে ইউসুফের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এ ছাড়া অন্যত্র কেবল সূরা আন'আম ৮৪ এবং সূরা মুমিন ৩৪ আয়াতে তাঁর নাম এসেছে।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে বলেন,

الكَرِيمُ بْنُ الْكَرِيمِ بْنِ الْكَرِيمِ يَوْسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ-

'নিশ্চয়ই মর্যাদাবানের পুত্র মর্যাদাবান, তাঁর পুত্র মর্যাদাবান, তাঁর পুত্র মর্যাদাবান। তাঁরা হলেন ইবরাহীমের পুত্র ইসহাক, তাঁর পুত্র ইয়াকুব ও তাঁর পুত্র ইউসুফ 'আলাইহিমুস সালাম' (তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক!)। বুখারী, মিশকাত হা/৪৮৯৪ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৩।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, সবচেয়ে সম্মানিত কে? তিনি বললেনঃ তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হল যে বেশী তাকওয়ার অধিকারী। লোকেরা বললঃ আমরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করছি না, তখন তিনি বললেনঃ তাহলে সবচেয়ে সম্মানিত হলেন আল্লাহর নবী ইউসুফ। তার পিতা একজন নবী ছিলেন, আর তার দাদাও একজন নবী, যেমনিভাবে তার পরদাদাও নবী। [বুখারী ৩৩৫০, মুসলিমঃ ২৩৭৮]

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ * وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ١٢:٣

আমরা আপনার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, ওহীর মাধ্যমে আপনার কাছে এ কুরআন পাঠিয়ে; যদিও এর আগে আপনি ছিলেন অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ “আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর অনেকদিন থেকে বিভিন্ন আয়াত নাযিল করছিল, তখন সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমাদেরকে কোন কিছা শোনাতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন এবং ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনী শোনান।” [ইতহাফ আল খিয়ারাহঃ ১/২৩৮, ১৬২ মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৩৪৫, ইবনে হিব্বান-আল ইহসান- ৬২০৯, দিয়া আল মাকদেসীঃ আল-মুখতারাহঃ ১০৬৯]

সুন্দরতম কাহিনী(কেনো বলা হয়েছে-)

প্রথমতঃ অন্যান্য নবীদের কাহিনী কুরআনের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন অনুসারে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইউসুফ নবীর ঘটনাবলী একত্রে সাজিয়ে একটি সূরাতে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবতঃ সেকারণে এটিকে 'أَحْسَنُ الْقَصَصِ' সুন্দরতম কাহিনী' বলা হয়েছে (ইউসুফ ১২/৩)।

দ্বিতীয়তঃ এর মধ্যে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা যেমনি অলৌকিক, তেমনি চমকপ্রদ ও শিক্ষণীয়।

তৃতীয়তঃ অন্যান্য নবীদের কাহিনীতে প্রধানতঃ উম্মতের অবাধ্যতা ও পরিণামে তাদের উপরে আপতিত গযবের কাহিনী এবং অন্যান্য উপদেশ ও হিকমত সমূহ প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতে রয়েছে দুনিয়ার তিক্ত বাস্তবতা এবং আল্লাহর উপরে অকুণ্ঠ নির্ভরতার সমন্বয়ে সৃষ্ট এক অতুলনীয় ও অভাবনীয় এক ট্রাজিক জীবন নাট্য। যা পাঠ করলে যেকোন বোদ্ধা পাঠকের জীবনে সৃষ্টি হবে সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপরে ভরসা ও তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণের এক অনুপম উদ্দীপনা।

قصص শব্দটি মাসদার (ক্রিয়া-বিশেষণ)। অর্থ হল কোন বস্তুর পেছনে লাগা। উদ্দেশ্য চমৎকার ঘটনা। কেচ্ছা, শুধু কোন কল্পিত কাহিনী বা মনোরঞ্জন উপন্যাসকে বলা হয় না; বরং অতীতে ঘটে গেছে এমন ঘটনার বর্ণনাকে (অর্থাৎ, তার পিছনে লাগাকে আরবীতে কিসসা) 'কেচ্ছা' বলা হয়। (ইউসুফ (আঃ)-এর) এ ঘটনা ঠিক অতীতে সংঘটিত ইতিহাসের বাস্তব বর্ণনা এবং এতে হিংসা ও শত্রুতার পরিণতি, আল্লাহর সাহায্যের আজব পদ্ধতি, মন্দ-প্রবণ মনের পাপাচরণের কুফল এবং মানুষের বিভিন্ন অবস্থার সুন্দর বর্ণনা এবং বড় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যার জন্য কুরআন একে 'সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী' বলে আখ্যায়িত করেছে।

সুন্দরতম কাহিনী

আল্লামা ইবন কাসীর এ আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যনির্দেশ করেছেন। তা হচ্ছে, যেহেতু এ কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছেন সেহেতু এ কিতাব নাযিল হওয়ার পর অন্য কোন কিতাবের প্রয়োজন নেই।

কারণ, একবার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোন এক কিতাবী লোক থেকে একটি প্রাচীন গ্রন্থ পেয়ে তা নিয়ে এসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! তোমরা কি পেরেশান হয়ে গেছ? পরিণাম বিবেচনা না করে যা-তা করে বেড়াবে? যত্র-তত্র ঢুকে যাবে? যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, অবশ্যই আমি এটাকে শুভ্র, স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হিসেবে নিয়ে এসেছি। তোমরা তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো না, ফলে তারা তোমাদেরকে কোন হক কথা জানাবে আর তোমরা মিথ্যা মনে করবে, আবার কোন বাতিল কথা জানাবে আর তোমরা সেটাকে সত্য মনে করবে। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, যদি মূসা জীবিত থাকতেন তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। [ইবন আবী আসেম: আস-সুন্নাহ ১/২৭]

সত্যনবী এবং শেষনবী জেনেও কপট ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রতি পদে পদে কষ্ট দিত এবং পরীক্ষা করার চেষ্টা করত। তাদের সমাজনেতা ও ধর্মনেতাদের কাজই ছিল সর্বদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা ও তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা। এ সময় মক্কায় কোন আহলে কিতাব বসবাস করত না এবং মক্কার লোকেরা ইউসুফ বা অন্য নবীদের সম্পর্কে কিছু জানতও না।

ফলে মদীনার কুচক্রী ইহুদীদের একটি দল মক্কায় এসে একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করল যে, বলুন দেখি, কোন নবী শামে (সিরিয়ায়) ছিলেন। অতঃপর তার ছেলেকে সেখান থেকে মিসরে বহিষ্কার করা হয়। তাতে ঐ ব্যক্তি কেঁদে অন্ধ হয়ে যান? (এটি বানোয়াট কথা। কেননা কেবলমাত্র কেঁদে কারু চোখ অন্ধ হয় না এবং এটি নবীগণের মর্যাদার খেলাফ)। একথার জওয়াবে অতঃপর সূরা ইউসুফ পুরাটা একত্রে নাযিল হয়। কুরতুবী, ইউসুফ ৭; ইবনু জারীর হা/১৮৭৮৬ ইবনু আববাস হ'তে।

তাদের পন্ডিভেরা তওরাত-ইঞ্জীলে বর্ণিত উক্ত ঘটনা আগে থেকেই জানতো। তাওরাত-যবুর-ইনজীল সবই ছিল হিব্রু ভাষায় রচিত। আমাদের রাসূল নিজের ভাষাতেই লেখাপড়া জানতেন না, অন্যের ভাষা জানা তো দূরের কথা। ইহুদী নেতাদের সূক্ষ্ম পলিসি ছিল এই যে, উক্ত বিষয়ে উম্মী নবী মুহাম্মাদ-এর পক্ষে জবাব দেওয়া আদৌ সম্ভব হবে না। ফলে লোকদের মধ্যে তার নবুঅতের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হবে এবং তার বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা যোরদার করা যাবে। বস্তুতঃ তাদের প্রশ্নের উত্তরে ইউসুফ (আঃ) ও ইয়াকুব পরিবারের প্রকৃত ঘটনা ‘অহি’ মারফত ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বর্ণনা করে দেন। যা ছিল রাসূলের জন্য নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ মু‘জেযা।

শুধু ইউসুফের ঘটনাই নয়, আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত কুরআনে বর্ণিত বাকী ২৪ জন নবী ও তাঁদের কওমের ঘটনাবলী বর্ণনা ছিল শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য মু‘জেযা। কেননা তাঁদের কারু সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। তাদের সম্পর্কে লিখিত কোন বই-পত্র সে যুগে ছিল না। আর তিনি নিজে কারু কাছে কখনো লেখাপড়া শিখেননি। অথচ বিশ্ব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া বিগত যুগের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উম্মাতকে শুনিয়ে গেছেন কুরআনের মাধ্যমে। এগুলিই তাঁর নবুঅতের অন্যতম প্রধান দলীল ছিল। এরপরেও খাছ করে ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর পিতা ইয়াকুব (আঃ)-এর পরিবারের ঘটনাবলী ছিল বিগত ইতিহাসের এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। যার প্রয়োজনীয় অংশগুলি গুছিয়ে একত্রিতভাবে উপস্থাপন করাই হ’ল সূরা ইউসুফের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য।

[3]. উল্লেখ্য যে, ইউসুফ (আঃ)-এর চরিত্র বাইবেলে অত্যন্ত বিকৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে (দ্রঃ সুলায়মান মানছুরপুরী, রহমাতুললিল আলামীন ২/২৪৪-২৪৬।

ইউসুফ (আঃ)-এর পিতা ছিলেন ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আঃ)। তাঁরা সবাই কেন‘আন বা ফিলিস্তীনের হেবরন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। ইয়াকুব (আঃ)-এর দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ইউসুফ ও বেনিয়ামীন। শেষোক্ত সন্তান জন্মের পরপরই তার মা মৃত্যুবরণ করেন। পরে ইয়াকুব (আঃ) তাঁর স্ত্রীর অপর এক বোন লায়লা-কে বিবাহ করেন। ইউসুফ-এর সাথে মিসরে পুনর্মিলনের সময় ইনিই মা হিসাবে সেখানে পিতার সাথে উপস্থিত ছিলেন। আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/২০৪ পৃঃ।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) মিসরে পুত্র ইউসুফের সাথে ১৭ বছর মতান্তরে ২০ বছরের অধিককাল অতিবাহিত করেন। অতঃপর ১৪৭ বছর বয়সে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে অছিয়ত করে যান যেন তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী হেবরন মহল্লায় পিতা ইসহাক ও দাদা ইবরাহীম (আঃ)-এর পাশে সমাহিত করা হয় এবং তিনি সেখানেই সমাধিস্থ হন। যা এখন ‘খলীল’ মহল্লা বলে খ্যাত। হযরত ইউসুফ (আঃ) ১১০ বছর বয়সে মিসরে ইন্তেকাল করেন এবং তিনিও হেবরনের একই স্থানে সমাধিস্থ হওয়ার জন্য সন্তানদের নিকটে অছিয়ত করে যান। এর দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস অঞ্চলের বরকত ও উচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়। হযরত ইয়াকুব-এর বংশধরগণ সকলে ‘বনু ইসরাঈল’ নামে খ্যাত হয়। তাঁর বারো পুত্রের মধ্যে মাত্র ইউসুফ নবী হয়েছিলেন। তাঁর রূপ-লাবণ্য ছিল অতুলনীয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আমি মি‘রাজ রজনীতে ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে দেখলাম যে, আল্লাহ তাকে সমগ্র বিশ্বের রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করেছেন’। মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৩ ‘মি‘রাজ’ অধ্যায়।

উল্লেখ্য যে, ছাহাবী বারা ইবনে আযেব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারাকে ‘পূর্ণ চন্দ্রের’ সাথে তুলনা করেছেন’। বুখারী হা/৩৩৮০ ‘নবীর গুণাবলী’ অনুচ্ছেদ।

শৈশবে ইউসুফের লালন-পালন ও চুরির ঘটনা

হাফেয ইবনু কাছীর বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ-এর জন্মের কিছুকাল পরেই বেনিয়ামীন জন্মগ্রহণ করেন। বেনিয়ামীন জন্মের পরপরই তাদের মায়ের মৃত্যু ঘটে। আল-বিদায়াহ ১/১৮৪ পৃঃ।

তখন মাতৃহীন দুই শিশুর লালন-পালনের ভার তাদের ফুফুর উপরে অর্পিত হয়। আল্লাহ তা‘আলা ইউসুফকে এত বেশী রূপ-লাবণ্য এবং মায়াশীল ব্যবহার দান করেছিলেন যে, যেই-ই তাকে দেখত, সেই-ই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। ফুফু তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। একদন্ড চোখের আড়াল হ’তে দিতেন না। এদিকে বিপত্নীক ইয়াকুব (আঃ) মাতৃহীনা দুই শিশু পুত্রের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর দুর্বল এবং সর্বদা ব্যাকুল থাকতেন। ইতিমধ্যে ইউসুফ একটু বড় হ’লে এবং হাঁটাচলা করার মত বয়স হ’লে পিতা ইয়াকুব (আঃ) তাকে ফুফুর নিকট থেকে আনতে চাইলেন। কিন্তু ফুফু তাকে ছাড়তে নারায়। ওদিকে পিতাও তাকে নিয়ে আসতে সংকল্পবদ্ধ। শুরু হ’ল পিতা ও ফুফুর মধ্যে মহববতের টানাপড়েন। ফলে ঘটে গেল এক অঘটন।

অধিক পীড়াপীড়ির কারণে ইউসুফকে যখন তার পিতার হাতে তুলে দিতেই হ’ল, তখন স্নেহান্বিত ফুফু গোপনে এক ফন্দি করলেন। তিনি স্বীয় পিতা হযরত ইসহাক (আঃ)-এর নিকট থেকে যে **একটা হাঁসুলি** পেয়েছিলেন এবং যেটাকে অত্যন্ত মূল্যবান ও বরকতময় মনে করা হ’ত, ফুফু সেই হাঁসুলিটিকে ইউসুফ-এর **কাপড়ের নীচে গোপনে** বেঁধে দিলেন।

অতঃপর ইউসুফ তার পিতার সাথে চলে যাওয়ার পর ফুফু জোরেশোরে প্রচার শুরু করলেন যে, তার মূল্যবান হাঁসুলিটি চুরি হয়ে গেছে। পরে তল্লাশী করে তা ইউসুফের কাছে পাওয়া গেল। ইয়াকুবী শরী‘আতের বিধান অনুযায়ী ফুফু ইউসুফকে তার গোলাম হিসাবে রাখার অধিকার পেলেন। ইয়াকুব (আঃ)ও দ্বিধা না করে সন্তানকে তার ফুফুর হাতে পুনরায় সমর্পণ করলেন। এরপর যতদিন ফুফু জীবিত ছিলেন, ততদিন ইউসুফ তার কাছেই রইলেন। তাফসীর ইবনে কাছীর, ইউসুফ ৭৭।

এই ছিল ঘটনা, যাতে ইউসুফ নিজের অজান্তে চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর বিষয়টি সবার কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল যে, তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে একেবারেই নির্দোষ। ফুফুর অপত্য স্নেহই তাকে ঘিরে এ চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছিল। এ সত্য কথাটি তার সৎভাইদেরও জানা ছিল। কিন্তু এটাকেই তারা ইউসুফের মুখের উপরে বলে দেয় যখন আরেক বানোয়াট চুরির অভিযোগে বেনিয়ামীনকে মিসরে গ্রেফতার করা হয়। ইউসুফ তাতে দারুণ মনোকষ্ট পেলেও তা চেপে রাখেন।

বলা বাহুল্য, শৈশবে যেমন ইউসুফ স্বীয় ফুফুর স্নেহের ফাঁদে পড়ে চোর (?) সাব্যস্ত হয়ে ফুফুর গোলামী করেন, যৌবনে তেমনি যুলায়খার চক্রান্তে পড়ে মিথ্যা অপবাদে অন্যান্য সাত বছর জেল খাটেন- যে ঘটনা পরে বর্ণিত হবে।

ইউসুফ-এর স্বপ্ন

বালক ইউসুফ একদিন তার পিতা ইয়াকুব (আঃ)-এর কাছে এসে বলল,

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ-

‘আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, ১১টি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সিজদা করছে’।

একথা শুনে পিতা বললেন, قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ-

‘বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহ’লে ওরা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু (ইউসুফ ১২/৪-৫)।

ইবনু আববাস (রাঃ) ও ক্বাতাদাহ বলেন, এগারোটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে ইউসুফ (আঃ)-এর এগারো ভাই এবং সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ পিতা ও মাতা বা খালা’। কুরতুবী, ইউসুফ ৪, ১০০ আয়াত।

আয়াতে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে স্বীয় স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন।
এতে বোঝা যায় যে,

- হিতাকাংখী ও সহানুভূতিশীল নয়- এরূপ লোকের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করা উচিত নয়।
- স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদর্শী নয়- এমন ব্যক্তির কাছেও স্বপ্ন ব্যক্ত করা সঙ্গত নয়।,
- কষ্টদায়ক বিপজ্জনক স্বপ্ন কারো কাছে বর্ণনা করতে নেই।

এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘স্বপ্ন পাখির পায়ের সাথে থাকে যতক্ষণ না সেটার ব্যাখ্যা করা হয়। যখনই সেটার ব্যাখ্যা করা হয়, তখনই সেটা পড়ে যায়। তিনি আরও বলেন, স্বপ্ন হচ্ছে নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। তিনি আরও বলেছেন, স্বপ্নকে যেন কোন বন্ধু বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও কাছে বিবৃত করা না হয়। [ইবন মাজাহ ৩৯১৪; মুসনাদ: ৪/১০]

অন্য হাদীসে এসেছে, তোমাদের কেউ যখন কোন পছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন যাকে মহব্বত করে তার নিকট বলে। আর যখন কোন খারাপ স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন তার অন্য পার্শ্বে শয়ন করে এবং বামদিকে তিনবার থুথু ফেলে, আল্লাহর কাছে এর অনিষ্ট হতে আশ্রয় চায়, কাউকে এ সম্পর্কে কিছু না বলে, ফলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

[মুসলিম: ২২৬২]

সহীহ হাদীসসমূহে বলা হয়েছে, ওহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার তরবারী ‘যুলফিকার’ ভেঙ্গে গেছে এবং আরো কিছু গাভীকে জবাই হতে দেখেছি। এর ব্যাখ্যা ছিল হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু-সহ অনেক মুসলিমের শাহাদাত বরণ। এটা একটা আশু মারাত্মক বিপর্যয় সম্পর্কিত ইঙ্গিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহাবীদের কাছে এ স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলেন। [মুস্তাদরাক হাকেমঃ ২৫৮৮, মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৭১]

এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, মুসলিমকে অপরের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য অপরের কোন মন্দ অভ্যাস কিংবা খারাপ উদ্দেশ্য প্রকাশ করা জায়েয। এটা গীবত কিংবা অসাম্মাতে পরনিন্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ আয়াতে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে বলে দিয়েছেন যে, ভাইদের পক্ষ থেকে তার প্রতি শত্রুতার আশংকা রয়েছে। [কুরতুবী]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যখন সময় ঘনিয়ে আসবে (কেয়ামত নিকটবর্তী হবে) তখন মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন প্রায়ই সত্য হবে। আর মুমিনের স্বপ্ন নবুয়তের চল্লিশতম অংশ, আর যা নবুওয়াতের এ অংশের স্বপ্ন, তা মিথ্যা হবে না। বলা হয়ে থাকে, স্বপ্ন তিন প্রকার।

এক প্রকার হচ্ছে মনের ভাষ্য,

আরেক প্রকার হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতি জাগ্রত করে দেয়া।

আর তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন হচ্ছে- আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখে তবে সে যেন তা কারো কাছে বিবৃত না করে; বরং উঠে এবং সালাত আদায় করে। [বুখারীঃ ৭০১৭]

বস্তুতঃ এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রকাশ পায় যখন মিসরে পিতা-পুত্রের মিলন হয়।

উল্লেখ্য যে, স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা জ্ঞানের একটি পৃথক শাখা। হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব সকলে এ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। সম্ভবতঃ একারণেই ইয়াকুব (আঃ) নিশ্চিত ধারণা করেছিলেন যে, বালক ইউসুফ একদিন নবী হবে। হযরত ইউসুফকেও আল্লাহ এ ক্ষমতা দান করেছিলেন। যেমন আল্লাহ এদিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন,

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ
- (إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ- (يوسف

‘এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন (নবী হিসাবে) এবং তোমাকে শিক্ষা দিবেন বাণী সমূহের (অর্থাৎ স্বপ্নাদিষ্ট বাণী সমূহের) নিগুঢ় তত্ত্ব এবং পূর্ণ করবেন স্বীয় অনুগ্রহ সমূহ (যেমন মিসরের রাজত্ব, সর্বোচ্চ সম্মান ও ধন-সম্পদ লাভ এবং পিতার সাথে মিলন প্রভৃতি) তোমার প্রতি ও ইয়াকুব-পরিবারের প্রতি, যেমন তিনি পূর্ণ করেছিলেন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি। নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়’ (ইউসুফ ১২/৬)।

উপরোক্ত ৫ ও ৬ আয়াতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ফুটে ওঠে। যেমন,

(১) ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফের দেখা স্বপ্নকে একটি সত্য স্বপ্ন হিসাবে গণ্য করেছিলেন এবং এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইউসুফ-এর জীবনে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। সেজন্য তার জীবনে আসতে পারে কঠিন পরীক্ষা সমূহ।

(২) ভাল স্বপ্নের কথা এমন লোকের কাছে বলা উচিত নয়, যারা তার হিতাকাংখী নয়। সেজন্যেই ইয়াকুব (আঃ) বালক ইউসুফকে তার স্বপ্ন বৃত্তান্ত তার সৎ ভাইদের কাছে বলতে নিষেধ করেছিলেন।

(৩) ইউসুফকে আল্লাহ তিনটি নে‘মত দানের সুসংবাদ দেন।

(ক) আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন নবী হিসাবে

(খ) তাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা দান করবেন

(গ) তার প্রতি স্বীয় নে‘মত সমূহ পূর্ণ করবেন। বলা বাহুল্য, এগুলির প্রতিটিই পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয়েছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে, যা আমরা পরবর্তী কাহিনীতে অবলোকন করব।

সত্য স্বপ্ন নবুয়তের অংশ-এর অর্থ কি? এর তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে তেইশ বৎসর পর্যন্ত ওহী আগমন করতে থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ছ'মাস স্বপ্নের আকারে এ ওহী আগমন করে। অবশিষ্ট পয়তাল্লিশ ষান্মাসিকে জিবরীলের মধ্যস্থতায় ওহী আগমন করে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬তম অংশ। [কুরতুবী] এখানে আরও জানা আবশ্যিক যে, হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সত্য স্বপ্ন অবশ্যই নবুয়তের অংশ, কিন্তু নবুওয়াত নয়। নবুওয়াত আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ভবিষ্যতে মুবাশশিরাত ব্যতীত নবুয়তের কোন অংশ বাকী নেই। সাহাবায়ে কেলাম বললেনঃ ‘মুবাশশিরাত’ বলতে কি বুঝায়? উত্তর হলঃ সত্য স্বপ্ন। [বুখারীঃ ৬৯৯০]

এতে প্রমাণিত হয় যে, নবুওয়াত কোন প্রকারে অথবা কোন আকারেই অবশিষ্ট নেই। শুধুমাত্র এর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অবশিষ্ট আছে যাকে মুবাশশিরাত অথবা সত্য স্বপ্ন বলা হয়।

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلْمُتَلَلِينَ ۝ ۹: ۱۲

অবশ্যই ইউসুফ এবং তার ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

এ আয়াতে বর্ণিত নিদর্শনসমূহ কি? এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে।

এক. এতে রয়েছে উপদেশ ও শিক্ষা।

দুই. আশ্চর্যজনক কথাসমূহ।

তিন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণ। কারণ, তিনি এ ঘটনা জানতেন না, যদি তার কাছে ওহী না আসে তো তিনি তা কিভাবে জানালেন?

চার. এর অর্থ হচ্ছে, যারা প্রশ্ন করে জানতে চায় এবং যারা জানতে চায় না তাদের সবার জন্যই রয়েছে নিদর্শন।

কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এ কাহিনীর মধ্যে অনেক প্রকার শিক্ষা রয়েছে। যেমন, এতে রয়েছে ভাইদের হিংসা, তাদের হিংসার পরিণতি, ইউসুফের স্বপ্ন এবং এর বাস্তবায়ন, কুপ্রবৃত্তি থেকে, দাসত্ব অবস্থা, বন্দিত্ব অবস্থা ইত্যাদিতে ইউসুফের সবার, বাদশাহী প্রাপ্তি, ইয়াকুবের পেরেশনী, তার ধৈর্য। শেষ পর্যন্ত প্রার্থিত অবস্থায় উপনীত হওয়া ইত্যাদি সবই এখানে নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে। [বাগভী] তাই এ সূরায় বর্ণিত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর কাহিনীকে শুধুমাত্র একটি কাহিনীর নিরিখে দেখা উচিত নয়; বরং এতে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বড় বড় নিদর্শন ও নির্দেশাবলী রয়েছে।

এক্ষণে ইউসুফকে উপরোক্ত ৬ আয়াতে বর্ণিত অহী আল্লাহ কখন নাযিল করেছিলেন, সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। তবে ১৫ আয়াতের মর্মে বুঝা যায় যে, তাঁকে কূপে নিষ্ক্ষেপ করার আগেই উপরোক্ত অহীর মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়। এটি নবুঅতের ‘অহিয়ে কালাম’ ছিল না। বরং এটি ছিল মূসার মায়ের কাছে অহী করার ন্যায় ‘অহিয়ে ইলহাম’। কেননা নবুঅতের ‘অহি’ সাধারণতঃ চল্লিশ বছর বয়সে হয়ে থাকে।

ভাইদের হিংসার শিকার হলেন

এটা একটা স্বভাবগত রীতি যে, বিমাতা ভাইয়েরা সাধারণতঃ পরস্পরের বিদ্বেষী হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ এই বিদ্বেষ যাতে মাথাচাড়া না দেয়, সেকারণ ইয়াকুব (আঃ) একই শ্বশুরের পরপর তিন মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। এরপরেও শ্বশুর ছিলেন আপন মামু। পরস্পরে রক্ত সম্পর্কীয় এবং ঘনিষ্ঠ নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং নবী পরিবারের সার্বক্ষণিক দ্বীনী পরিবেশ ও নৈতিক প্রশিক্ষণ থাকা সত্ত্বেও বৈমাত্রেয় হিংসার কবল থেকে ইয়াকুব (আঃ)-এর দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানেরা রক্ষা পায়নি।

তাই বলা চলে যে, ইউসুফের প্রতি তার সৎভাইদের হিংসার প্রথম কারণ ছিল বৈমাত্রেয় বিদ্বেষ।

দ্বিতীয় কারণ ছিল- সদ্য মাতৃহীন শিশু হওয়ার কারণে তাদের দু’ভাইয়ের প্রতি পিতার স্বভাবগত স্নেহের আধিক্য।

তৃতীয় কারণ ছিল, ইউসুফের অতুলনীয় রূপ-লাবণ্য, অনিন্দ্যসুন্দর দেহসৌষ্ঠব, আকর্ষণীয় ব্যবহার-মাধুর্য এবং অনন্য সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থ ইউসুফের স্বপ্নবৃত্তান্তের কথা যেকোন ভাবেই হোক তাদের কানে পৌঁছে যাওয়া। বলা চলে যে, শেষোক্ত কারণটিই তাদের হিংসার আগুনে ঘটাহুতি দেয় এবং তাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেওয়ার শয়তানী চক্রান্তে তারা প্ররোচিত হয়।

কিন্তু শয়তান যতই চক্রান্ত করুক, আল্লাহ বলেন, **إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا** -

‘শয়তানের চক্রান্ত সর্বদাই দুর্বল হয়ে থাকে’ (নিসা ৪/৭৬)। ইউসুফের মধ্যে ভবিষ্যৎ নবুঅত লুকিয়ে আছে বুঝতে পেরেই ইয়াকুব (আঃ) তার প্রতি অধিক স্নেহশীল ছিলেন। আর সেকারণে সৎ ভাইয়েরাও ছিল অধিক হিংসাপরায়ণ। বস্তুতঃ এই হিংসাত্মক আচরণের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল ইউসুফের ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান।

৮. স্মরণ করুন, তারা বলেছিল, আমাদের পিতার কাছে ইউসুফ এবং তার ভাই তো আমাদের চেয়ে বেশী প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল; আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছে।

এ আয়াত থেকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর কাহিনী শুরু হয়েছে। ইউসুফ 'আলাইহিস সালাম-এর ভ্রাতারা পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-কে দেখল যে, তিনি ইউসুফের প্রতি অসাধারণ মহব্বত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তারা পরস্পর বলাবলি করলঃ আমরা পিতাকে দেখি যে, তিনি আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার অনুজ বিনইয়ামীনকে অধিক ভালবাসেন। অথচ আমরা দশজন এবং তাদের জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে গৃহের কাজকর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থালীর কাজ করার শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হল এ বিষয় অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে অধিক মহব্বত করা। আমাদের পিতা আসলে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিবহাল নন। তার উচিত আমাদেরকে প্রাধান্য দেয়া। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই তোমরা হয় ইউসুফকে হত্যা কর, না হয় এমন দূর দেশে নির্বাসিত কর, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে না পারে।

হিংসা অর্থ আল্লাহ অন্যকে যে নে'মত দান করেছেন তাকে হিংসা করা এবং উক্ত নে'মতের ধ্বংস কামনা করা'। আর হিংসুক হ'ল, হিংসাকৃত ব্যক্তির নে'মত ধ্বংসের আকাংখী'। হিংসার পিছে পিছে আসে বিদ্বেষ। সে তখন সর্বদা ঐ ব্যক্তির মন্দ কামনা করে। যেমন মুমিনদের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

‘ وَإِن تَصَبَّحْتُمْ سَائِلِينَ يَفْرَحُوا بِهَا ‘
‘ যদি তোমাদের কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তাতে তারা অসন্তুষ্ট হয়।
আর যদি তোমাদের কোন অকল্যাণ হয়, তাতে তারা আনন্দিত হয়’ (আলে ইমরান ৩/১২০)। বস্তুতঃ এ দু'টি বদস্বভাবের মধ্যে ঈমানের কোন অংশ নেই। কেননা মুমিন সর্বদা অন্যের শুভ কামনা করে। যেমন সে সর্বদা নিজের শুভ কামনা করে।

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ করো না, হিংসা করো না, ষড়যন্ত্র করো না ও সম্পর্ক ছিন্ন করো না। তোমরা পরস্পরে আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও’।

বুখারী হা/৬০৭৬; মুসলিম হা/২৫৫৯; মিশকাত হা/৫০২৮।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীছে মানবতাকে হত্যাকারী কয়েকটি দুরারোগ্য ব্যাধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামী সমাজকে ভিতর থেকে ধ্বংস করে দেয়। এখানে চারটি বিষয় উল্লেখ করা হলেও তা মূলতঃ একটি থেকে উৎসারিত। আর তা হ’ল ‘হিংসা’। এই মূল বিষয়বস্তু থেকেই বাকীগুলি কাঁটায়ুক্ত ও যন্ত্রণাদায়ক ডাল-পালার ন্যায় বেরিয়ে আসে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ' لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ' তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য ঐ বস্তু ভালবাসবে, যা সে নিজের জন্য ভালবাসে’। বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৪৯৬১। যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে, তার ঈমান হয় ক্রটিপূর্ণ। হিংসা তার সমস্ত নেকীকে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন ধীরে ধীরে কাঠকে খেয়ে ফেলে। এভাবে সে নিজের আগুনে নিজে জ্বলে মরে। পরিণামে তার পূর্বে কৃত সৎকর্ম সমূহের নেকীগুলিও ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় তার মৃত্যু হ’লে সে নিঃস্ব অবস্থায় আল্লাহর কাছে চলে যায়।

সূরা বনী ইসরাইলের ১৭ নং আয়াতে উল্লেখ করছেন,

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

“নিশ্চয় তোমার রব যাকে ইচ্ছা তার জন্য রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তার জন্য রিযিক সীমিত করে দেন। আর অবশ্যই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত এবং প্রত্যক্ষদর্শী।

হযরত যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়াম (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ ۝

তোমাদের মধ্যে পিপীলিকার ন্যায় প্রবেশ করবে বিগত উম্মতগণের রোগ। আর তা হ’ল হিংসা ও বিদ্বেষ। যা হ’ল ছাফকারী

لَا أَقُولُ تَخْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَخْلِقُ الدِّينَ ۝

আমি বলিনা যে চুল ছাফ করবে, বরং তা দ্বীনকে ছাফ করে ফেলবে’। তিরমিযী; মিশকাত হা/৫০৩৯। অর্থাৎ ক্ষুর ও ব্লেড যেমন চুল ছাফ করে দেয়। হিংসা ও বিদ্বেষ তেমনি দ্বীনকে বিদূরিত করে দেয়।

হৃদয়কে হিংসামুক্ত রাখার উপায়

আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদীকে শিখিয়ে দিয়েছেন,

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের সেইসব ভাইকে তুমি ক্ষমা কর। যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর তুমি আমাদের অন্তরে মুমিনদের বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্বেষ সঞ্চার করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই তুমি স্নেহশীল ও দয়াবান’ (হাশর ৫৯/১০)।

ইউসুফ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হ'লেন

দশ জন বিমাতা ভাই মিলে ইউসুফকে হত্যার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য তাকে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতারণার আশ্রয় নিল। তারা একদিন পিতা ইয়াকুব (আঃ)-এর কাছে এসে ইউসুফকে সাথে নিয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে আনন্দ ভ্রমণে যাবার প্রস্তাব করল। তারা পিতাকে বলল যে, ‘আপনি তাকে আগামীকাল আমাদের সাথে প্রেরণ করুন। সে আমাদের সঙ্গে যাবে, তৃপ্তিসহ খাবে আর খেলাধুলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব’। জবাবে পিতা বললেন, আমার ভয় হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, আর কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে’।

‘তারা বলল, আমরা এতগুলো ভাই থাকতে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে, তাহ’লে তো আমাদের সবই শেষ হয়ে যাবে’ (ইউসুফ ১২/১২-১৪)। উল্লেখ্য যে, কেন‘আন অঞ্চলে সে সময়ে বাঘের প্রাদুর্ভাব ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) প্রমুখাত বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াকুব (আঃ) পূর্বরাতে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তিনি পাহাড়ের উপরে আছেন। নীচে পাহাড়ের পাদদেশে ইউসুফ খেলা করছে। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু তাদের মধ্যকার একটি বাঘ এসে তাকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর ইউসুফ মাটির ভিতরে লুকিয়ে যায়’। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন যে, উক্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইয়াকুব (আঃ) তার দশ পুত্রকেই দশ ব্যাঘ্র গণ্য করেছিলেন। কিন্তু তাদের কাছে রূপকভাবে সেটা পেশ করেন। যাতে তারা বুঝতে না পারে (কুরতুবী)।

যাইহোক ছেলেদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে তিনি রাযী হলেন। কিন্তু তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যাতে তারা ইউসুফকে কোনরূপ কষ্ট না দেয় এবং তার প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখে। অতঃপর তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াজুদ বা রুবীল-এর হাতে ইউসুফকে সোপর্দ করলেন এবং বললেন, তুমিই এর খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য সকল ব্যাপারে দেখাশুনা করবে। কিন্তু জঙ্গলে পৌঁছেই শয়তানী চক্রান্ত বাস্তবায়নের জন্য তারা তৎপর হয়ে উঠলো। তারা ইউসুফকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হ’ল। তখন বড় ভাই ইয়াজুদ তাদের বাধা দিল এবং পিতার নিকটে তাদের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। কিন্তু শয়তান তাদেরকে আরও বেশী যেদী করে তুলল। অবশেষে বড় ভাই একা পেরে না উঠে প্রস্তাব করল, বেশ তবে ওকে হত্যা না করে বরং ঐ দূরের একটা পরিত্যক্ত কুয়ায় ফেলে দাও। যাতে কোন পথিক এসে ওকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তাতে তোমাদের দু’টো লাভ হবে। এক- সে পিতার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে ও তোমরা তখন পিতার নিকটবর্তী হবে। দুই- নিরপরাধ বালককে হত্যা করার পাপ থেকে তোমরা বেঁচে যাবে।

ভাইদের এই চক্রান্তের কথা আল্লাহ ব্যক্ত করেছেন নিম্নোক্তভাবে-

‘নিশ্চয়ই ইউসুফ ও তার ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্য রয়েছে নিদর্শনাবলী’ (৭)। ‘যখন তারা বলল, অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয়। অথচ আমরা একটা ঐক্যবদ্ধ শক্তি বিশেষ। নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন’ (৮)। ‘তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোথাও ফেলে আস। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরাই (পিতার নিকটে) যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে’ (৯)। ‘তখন তাদের মধ্যকার একজন (বড় ভাই) বলে উঠল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং ফেলে দাও তাকে অন্ধকূপে, যাতে কোন পথিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, যদি একান্তই তোমাদের কিছু করতে হয়’ (ইউসুফ ১২/৭-১০)। বড় ভাইয়ের কথায় সবাই একমত হয়ে ইউসুফকে কূয়ার ধারে নিয়ে গেল। এ সময় তারা তার গায়ের জামা খুলে নিল। নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যায় যে, এ সময় ৬/৭ বছরের কচি বালক ইউসুফ তার ভাইদের কাছে নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। কিন্তু শয়তান তাদেরকে হিংসায় উন্মত্ত করে দিয়েছিল। এই কঠিন মুহূর্তে ইউসুফকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তার নিকটে অহী নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে এটি নবুঅতের অহী ছিল না। কেননা সাধারণতঃ চল্লিশ বছর বয়স হওয়ার পূর্বে আল্লাহ কাউকে নবী করেন না। এ অহী ছিল সেইরূপ, যে রূপ অহী বা ইলহাম এসেছিল শিশু মূসার মায়ের কাছে মূসাকে বাঞ্ছা ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেবার জন্য (ত্বায়াহা ২০/৩৮-৩৯)।

এ সময়কার মর্মস্তুদ অবস্থা আল্লাহ বর্ণনা করেন এভাবে,

‘যখন তারা তাকে নিয়ে চলল এবং অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হ’ল, এমতাবস্থায় আমি তাকে (ইউসুফকে) অহী (ইলহাম) করলাম যে, (এমন একটা দিন আসবে, যখন) অবশ্যই তুমি তাদেরকে তাদের এ কুকর্মের কথা অবহিত করবে। অথচ তারা তোমাকে চিনতে পারবে না’ (ইউসুফ ১২/১৫)।

ইমাম কুরতুবী বলেন যে, কূপে নিষ্কিণ্ড হওয়ার পূর্বেই অথবা পরে ইউসুফকে সান্ত্বনা ও মুক্তির সুসংবাদ দিয়ে এ অহী নাযিল হয়েছিল। ইউসুফকে তার ভাইয়েরা কূপে নিষ্কপ করল। সেখানেও আল্লাহ তাকে সাহায্য করলেন। তিনি কূয়ার নীচে একখন্ড পাথরের উপরে স্বচ্ছন্দে বসে পড়লেন। বড় ভাই ইয়াজুদা গোপনে তার জন্য দৈনিক একটা পাত্রের মাধ্যমে উপর থেকে খাদ্য ও পানীয় নামিয়ে দিত এবং দূর থেকে সর্বক্ষণ তদারকি করত।

পিতার নিকটে ভাইদের কৈফিয়ত

ইউসুফকে অন্ধকূপে ফেলে দিয়ে একটা ছাগলছানা যবেহ করে তার রক্ত ইউসুফের পরিত্যক্ত জামায় মাখিয়ে তারা সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরল এবং কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে হাযির হয়ে ইউসুফকে বাঘে নিয়ে গেছে বলে কৈফিয়ত পেশ করল। প্রমাণ স্বরূপ তারা ইউসুফের রক্ত মাখা জামা পেশ করল। হতভাগারা এটা বুঝেনি যে, বাঘে নিয়ে গেলে জামাটা খুলে রেখে যায় না। আর খুললেও বাঘের নখের আঁচড়ে জামা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার কথা। তাছাড়া যে পিতার কাছে তারা মিথ্যা কৈফিয়ত পেশ করছে, তিনি একজন নবী। অহীর মাধ্যমে তিনি সবই জানতে পারবেন। কিন্তু হিংসায় অন্ধ হয়ে গেলে মানুষ সবকিছু ভুলে যায়।

ইউসুফের ভাইদের দেওয়া কৈফিয়ত ও পিতার প্রতিক্রিয়া আল্লাহ বর্ণনা করেন নিম্নোক্ত রূপে,

‘তারা (ভাইয়েরা) রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এল’। ‘এবং বলল, হে পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আসবাবপত্রের কাছে বসিয়ে রেখেছিলাম। এমতাবস্থায় তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী’। ‘এ সময় তারা তার মিথ্যা রক্ত মাখানো জামা হাযির করল। (এটা দেখে অবিশ্বাস করে ইয়াকুব বললেন, কখনোই নয়) বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটা কথা তৈরী করে দিয়েছে। (এখন আর করার কিছুই নেই), অতএব ‘ছবর করাই শ্রেয়। তোমরা যা কিছু বললে তাতে আল্লাহই আমার একমাত্র সাহায্যস্থল’ (ইউসুফ ১২/১৬-১৮)।

কাফেলার হাতে ইউসুফ

সিরিয়া থেকে মিসরে যাওয়ার পথে একটি ব্যবসায়ী কাফেলা পথ ভুলে জঙ্গলের মধ্যে উক্ত পরিত্যক্ত কুয়ার নিকটে এসে তাঁর ফেলে। কুরতুবী, ইউসুফ ১৯; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১/১৮৯।

তারা পানির সন্ধানে তাতে বালতি নিষ্ক্ষেপ করল। কিন্তু বালতিতে উঠে এল তরতয়া সুন্দর একটি বালক ‘ইউসুফ’। সাধারণ দৃষ্টিতে এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে হ’লেও সবকিছুই ছিল আল্লাহর পূর্ব পরিকল্পিত এবং পরস্পর সংযুক্ত অটুট ব্যবস্থাপনারই অংশ। ইউসুফকে উদ্ধার করার জন্যই আল্লাহ উক্ত কাফেলাকে পথ ভুলিয়ে এখানে এনেছেন। তাঁর গোপন রহস্য বুঝবার সাধ্য বান্দার নেই। আবুবকর ইবনু আইয়াশ বলেন, ইউসুফ কুয়াতে তিনদিন ছিলেন। তাফসীর ইবনে কাছীর, ইউসুফ ১৯।

কিন্তু আহলে কিতাবগণ বলেন, সকালে নিষ্ক্ষেপের পর সন্ধ্যার আগেই ব্যবসায়ী কাফেলা তাকে তুলে নেয়। ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১/১৮৮। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

কাফেলার মধ্যকার জনৈক ব্যক্তির নিষ্ক্ষিপ্ত বালতিতে ইউসুফ উপরে উঠে আসেন। অনিন্দ্য সুন্দর বালক দেখে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো ‘কি আনন্দের কথা। এ যে একটি বালক!’ এরপর তারা তাকে মালিকবিহীন পণ্যদ্রব্য মনে করে লুকিয়ে ফেলল। কেননা সে যুগে মানুষ কেনাবেচা হ’ত। কিন্তু তারা গোপন করতে পারল না। কারণ ইতিমধ্যে ইউসুফের বড় ভাই এসে কুয়ায় তাকে না পেয়ে অনতিদূরে কাফেলার খোঁজ পেয়ে গেল। তখন সে কাফেলার কাছে গিয়ে বলল, ছেলেটি আমাদের পলাতক গোলাম। তোমরা ওকে আমাদের কাছ থেকে খরিদ করে নিতে পার’। কাফেলা ভাবল খরিদ করে না নিলে চোর সাব্যস্ত হয়ে যেতে পারি। অতএব তারা দশ ভাইকে হাতে গণা কয়েকটি দিরহাম দিয়ে নিতান্ত সস্তা মূল্যে ইউসুফকে খরিদ করে নিল। এর দ্বারা ইউসুফের ভাইদের দু’টি উদ্দেশ্য ছিল।

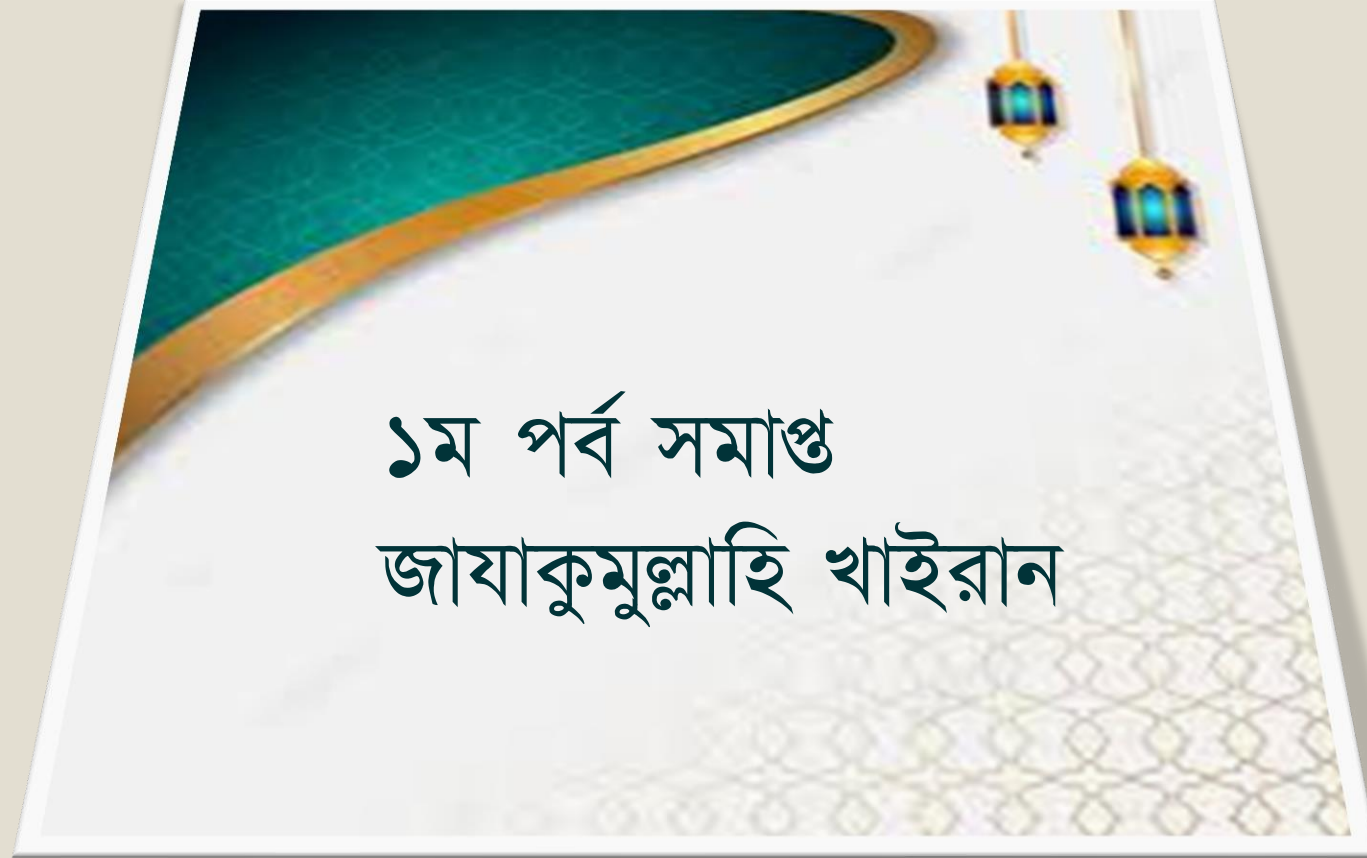
এক- যাতে ইউসুফ তার বাপ-ভাইদের নাম করে পুনরায় বাড়ী ফিরে আসার সুযোগ না পায়।

দুই- যাতে ইউসুফ দেশান্তরী হয়ে যায় ও অন্যের ক্রীতদাস হয়ে জীবন অতিবাহিত করে এবং কখনোই দেশে ফিরতে না পারে।

এই সময়কার দৃশ্য কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। নিজের ভাইয়েরা ইউসুফকে পরদেশী কাফেলার হাতে তাদের পলাতক গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দিচ্ছে। নবীপুত্র ইউসুফের মনের অবস্থা ঐ সময় কেমন হচ্ছিল। কল্পনা করা যায় কি? বালক ইউসুফ ঐ সময় বাড়ী যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তেমন কোন কথা কুরআনে বর্ণিত হয়নি। তাতে মনে হয়, বিক্রয়ের ঘটনাটি তার অগোচরে ঘটেছিল। ভাইদের সাথে পুনরায় দেখা হয়নি (আল্লাহ সর্বাধিক অবগত)। ইউসুফকে কূয়া থেকে উদ্ধার ও পরে পলাতক গোলাম হিসাবে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে দেবার ঘটনা আল্লাহর ভাষায় নিম্নরূপ-

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ ُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ-
(۱۹-۲۰) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ- (يوسف)

‘অতঃপর একটা কাফেলা এল এবং তারা তাদের পানি সংগ্রহকারীকে পাঠালো। সে বালতি নিষ্ক্ষেপ করল। (বালতিতে ইউসুফের উঠে আসা দেখে সে খুশীতে বলে উঠল) কি আনন্দের কথা! এযে একটি বালক! অতঃপর তারা তাকে পণ্যদ্রব্য গণ্য করে গোপন করে ফেলল। আল্লাহ ভালই জানেন, যা কিছু তারা করেছিল’। ‘অতঃপর ওরা (ইউসুফের ভাইয়েরা) তাকে কম মূল্যে বিক্রয় করে দিল হাতে গণা কয়েকটি দিরহামের (রৌপ্যমুদ্রার) বিনিময়ে এবং তারা তার (অর্থাৎ ইউসুফের) ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল’ (ইউসুফ ১২/১৯-২০)। মূলতঃ ইউসুফকে দূরে সরিয়ে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।



১ম পর্ব সমাপ্ত
জাযাকুমুল্লাহি খাইরান